নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী (Nation)

যতীন বালা

রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আর্থিক বিন্যাস, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল—প্রভৃতি সমস্ত কিছুই গড়ে তোলে মানুষই। তাই এই মানুষের ইতিহাসই যথাযথ ইতিহাস। এই মানুষ কালের পরিমাপে ত্রিধারাযুক্ত অর্থাৎ যুগপৎ-অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যতে প্রসারিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও রাজনৈতিক ব্যক্তিমানুষ তথা সমষ্টিমানুষ। এই মানুষই সম্পূর্ণ মানুষ—তার একটি কর্ম আর একটি কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে দেখা আর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। একটি কর্মের সঙ্গে অপরাপর কর্মকে যুক্ত করে দেখলে দেখা আর পরিচয় তবেই তার সম্পূর্ণ রূপ ও প্রকৃতি ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। দেশকালে ধৃত মানুষের সমাজ-সভ্যতা-কৃষ্টি সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য এবং সর্বত্র স্বীকৃত। মানবিক-সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যায় এবং আলোচনায় এই সত্য স্বীকৃত যে, মানুষের সমাজ-সভ্যতাই মানুষের সর্বপ্রকার কর্মকৃতির উৎস এবং সেই সমাজের বিবর্তনের-আবর্তনের ইতিহাসই দেশকালধৃত মানব ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে। ভারতবর্ষে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধানে এই সত্যই পরিপূরক হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে ইতিহাস বিদ্যার জন্ম রাজশক্তির ঔরসে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই যে রাজশক্তির শাসনদণ্ডটিকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে। যাঁরা ইতিহাস লিখতেন, তাঁরা রাজার অথবা রাজশক্তির ক্ষমতা যাদের হাতে তাদের আদেশে অথবা অনুগ্রহেই ইতিহাস লিখতেন। আর সে ইতিহাস হত রাজ-রাজড়াদের বা রাজশক্তির ক্ষমতা যাদের হাতে তাদের যুদ্ধবিগ্রহ আর জয়ের কীর্তিকাহিনীর ইতিহাস। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের কোনও খবরই সে ইতিহাসে স্থান পেত না। রাজার প্রতি, রাজশক্তির ক্ষমতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল ধরাবাঁধা।

ইতিহাস চেতনার পরবর্তী ধাপটি হল ঔপনিবেশিক ডা. যা ইতিহাস বিদ্যার গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। বিদেশিরা অস্ত্রবলে, কূটকৌশলে নতুন দেশ দখল করে বিজেতাদের উপর চাপিয়ে দেয় তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় মতাদর্শ এবং মুছে ফেলে বিজেতার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সাফল্যের যাবতীয় চিহ্নসমূহ। বিদেশি ঔপনিবেশকারী তার শাসন-শোষণের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে বিজেতার সমাজকাঠামো সম্পূর্ণ পালটে দেয়। কখনও বা নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধ করতে সম্পূর্ণ উলটে দেয়। এই পরিমণ্ডলে উপনিবেশিকতার কাজে যারা সহযোগিতা করত তাদের দিয়ে ঔপনিবেশিকবাদীরা তাদের নিজের মতো করে ইতিহাস লেখাতেন। ঐতিহাসিক তথ্যসত্য সেখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হত। সে ইতিহাসে থাকত কেবলই ঔপনিবেশিকদের গুণকীর্তন আর জাতি হিসাবে পৃথিবীতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। প্রভুশক্তি আর প্রভু সংস্কৃতিকে,

ধর্মকে, ভাষাকে জোর করে বিজেতার উপর চাপিয়ে দিত এবং বিজেতার সংস্কৃতিকে, ভাষাকে, ইতিহাস এই ঘটনার সাক্ষী হলেও ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস লিখতেন বা ঔপনিবেশিক লেখাতেন, ঐতিহাসিকতার প্রভুশক্তির দিকেই ঝোল টানতেন। অর্থাৎ ইতিহাসে শাসক শ্রেণির বা গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব, পক্ষপাতিত্ব ও জয় ঘোষিত হত। বিজয়ী ঔপনিবেশিকের নির্দেশেই ঐতিহাসিক বিজেতা জাতির নানা হীনতাসূচক বিশেষণ জুড়ে দিয়ে বিজেতাকে ইতিহাসের আবর্জনায় ছুঁড়ে ফেলে দিত, যাতে বিজেতা কোনওকালে তার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষমতায় ফিরে আসতে না পারে, বিজেতাকে বিজয়ী তার ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিধানে বন্দি করে ফেলত যাতে কোনওকালে বিজেতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাসন-শোষণ দণ্ডটি কেড়ে নিতে না পারে বা বিপ্লব ঘটাতে না পারে।

ইতিহাসবিদ্যার আর একটি লক্ষণ হল—সমাজের উচ্চবর্গের প্রতি ঐতিহাসিকের পক্ষপাতিত্ব। ক্ষমতা যখন যার হাতে, যার দখলে, ইতিহাস তখন তার স্বার্থ সংরক্ষণ করেই লেখা হয়। শিক্ষাসংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ায় যখন যারা বসে থাকে,—ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সেইদিকেই পড়ে, তাদের গুণকীর্তন করেই ইতিহাস লেখা হয়। মাটি ঘেঁষা সাধারণ মানুষ তলিয়ে যান ইতিহাসের অন্ধকারে। উচ্চবর্গের সামান্যতম কৃতিত্ব ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিরাট মহান করে তোলা হয়। অন্যদিকে নিম্নবর্গের কোনও ব্যক্তি যুগান্তকারী কৃতিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসে তাঁর নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় না। উল্লেখ করা হয় না ইচ্ছাকৃতভাবেই। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি ইতিহাস চেতনায় ঐতিহাসিক তার সংকীর্ণ শ্রেণি বা গোষ্ঠী চেতনার সীমা অতিক্রম করতে পারেন না।

নিম্নবর্গের দলিত মানুষদের এবং তাদের কর্মকাণ্ডের কোনও স্বীকৃতিই ভারতবর্ষের তথাকথিত ইতিহাসে আজও লেখা হয়নি। যদিও বা কোথাও কখনও ছিটেফোঁটা লেখা হয়ে থাকে তাতে সত্যতথ্য বিকৃত করা হয়েছে। আসল সত্যকে গোপন করা হয়েছে অথবা পাশ কাটিয়ে ভিন্নার্থে, হীনার্থে লেখা হয়েছে। তাই শোষিত যারা নিম্নবর্গের, নিম্নবর্ণের মানুষ, দলিত বহুজন আদিবাসী, শোষিতের ইতিহাসের দলিতের ইতিহাস, শোষিত-দলিতকেই লিখতে হবে। কিন্তু সেই পথে এগোতে গেলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, উচ্চবর্গের, উচ্চবর্ণের প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গী ও তার বাহন প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত আদিকল্পটি শোষিতের স্বাধীন চলার পথটি জুড়ে বসে আছে। তাই সাব-অল-টার্ন-তত্ত্ব চেতনার নতুনতর মূল্যবোধের স্বচ্ছ আলোর পথ ধরে নিজস্ব ভূমিসংলগ্ন মৌলিক দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তথাকথিত উচ্চবর্ণের ঐতিহাসিকগণের পক্ষে যে ইতিহাস কোনওদিন লেখা সম্ভব হয়নি, তা দলিতদেরই লিখতে হবে একেবারে ভেতর থেকে, রক্তে হয়ে ওঠা বীজ থেকে অঙ্কুরিত নতুন চারাটির মতো আর এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আর একটি আদিকল্পের প্রেরণায়। নিম্নবর্গের, দলিতদের স্বকীয় চৈতন্যের শ্রেণিচেতনা যার অন্যতম উপাদান। দলিত বাস্তবতা যার মাপকাঠি, সত্য তথ্য উন্মোচনই যার মৌলিক সত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক চেতনা যার হাতিয়ার।

আমরা দেখেছি প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক, জীবনী সাহিত্য, সাংস্কৃতিক আন্দোলন

নিয়ে পালিয়ে যান তিব্বতে, চিনে তাঁদের প্রাণ বাঁচাতে। এইজন্য পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নেপাল ও তিব্বতে, যে গ্রন্থের নাম রাখা হয় 'চর্যাপদ'। আর যারা যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরাই বিখ্যাত নমঃশূদ্রগণ। এইজন্য এই বিশেষ অঞ্চল নমঃশূদ্র প্রধান অঞ্চল হিসাবে গড়ে ওঠে।

বল্লাল সেন এবং তাঁর বশংবদ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই নমঃশূদ্রদের প্রতি অর্থাৎ বিদ্রোহী বৌদ্ধদের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ হয়ে রইলেন এবং বহুভাবে তদের ঐতিহ্যচ্যুত করতে চেষ্টা করলেন। সম্রাট মহাপদ্মনন্দ এবং সম্রাট অশোকের আকাশচুম্বী ঐতিহ্য-বংশমর্যাদা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই নমঃশূদ্রগণকে চণ্ডাল, চেঙ, নমো প্রভৃতি বিকৃত নামে চিহ্নিত করল । নমঃশূদ্রদের জাতি নাম যেমন বিকৃত করল, তেমনি সমাজেও জল-অচল অস্পৃশ্য করে ছাড়ল। কিন্তু দলিত বিজিত নমঃশূদ্রগণ কখনও তাদের জাতি নাম 'নমঃশূদ্র' ত্যাগ করেননি। শতাব্দীর পর শতাব্দী নমঃশূদ্রগণ নিজেরা নিজেদেরকে নমঃশূদ্র বলেই পরিচয় দিয়ে এসেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কৌশল খাটিয়ে নমঃশূদ্র নামের পরিবর্তে চণ্ডাল লিখেছে এবং ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়েছে তাঁদের প্রতি।

বল্লাল সেনের আমল থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নমঃশূদ্র তথা শূন্যবাদী বৌদ্ধদের এবং বৌদ্ধ শ্রমণদের উপর এমন কঠোর অত্যাচার শুরু করল যে, গৌতমবুদ্ধের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলে তাঁর মাথা কাটা যেত। এ দেশের ধ্বংস-উন্মুখ বৌদ্ধদের বাঁচার জন্য নতুন পথ এবং মতের আড়াল সৃষ্টি করেন একদল মনীষী ব্যক্তি। পূর্ববঙ্গের 'দেউল' বা চড়ক বা শিবপূজার কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই। দেউল-চড়ক-শিবপূজায় পুরোহিত গায়ক মূল সন্ন্যাসীর নাম 'বালা'। 'বালা'রা পায়ে মল বা ঘুঙুর বেঁধে নেচে নেচে যে গান বা শ্লোক সুর সংযোগ মন্ত্র তথা বালাই শ্লোক উচ্চারণ করেন, তাই 'বালাই শ্লোক'। এই বালাই শ্লোক বা বালাকিকে বাদ দিয়ে এই পূজা বা উৎসব অনুষ্ঠান হয় না। দেউল উৎসবের 'গর্জন' শব্দের অপভ্রংশ 'গাজন' শব্দে বৌদ্ধ শ্রমণদের কথাই মনে পড়ে। 'বালাই' শব্দে সমাজকে অমঙ্গল থেকে মঙ্গলে নিয়ে যান মূল নীল সন্ন্যাসীগণ বা নীল উৎসবের মূল 'বালা' বা প্রকৃত অর্থে যাঁরা শ্রমণ সন্ন্যাসী। বালাদের ব্যবহৃত রঙিন বস্ত্র এবং শ্রমণ সন্ন্যাসীদের রঙিন বস্ত্র একই চেতনার আলো থেকে নির্বাচিত হয়েছে। 'ঘূর্ণমান চক্র'বা চড়ক 'বৌদ্ধধর্মচক্র' প্রবর্তনের আভাস দেয়। হবিষ্যাসী 'নীল সন্ন্যাসী'রা-'বালা'রা বৌদ্ধ শ্রমণেরই প্রতিকৃতি। যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জনপদভূমির অবমানসে 'দেউল চড়ক' নীল উৎসবের আড়ালে বৌদ্ধমত ও পথের ধারা আজও বেঁচে আছে, বেঁচে আছে 'নমঃশূদ্র' নামের আড়ালে নন্দ রাজবংশের, মৌর্য রাজবংশ এবং তাঁদের আকাশচুম্বী ঐতিহ্য-ইতিহাস এবং মানুষ হিসাবে তাঁদের দৈহিকমান, চারিত্রিক গুণ, দুঃসাহসী, শক্তিশালী ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ জ্ঞাতি পরিচয় 'যোদ্ধা'। যা নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজনের চারিত্রিক গুণ...।

সংখ্যার দিক দিয়ে নমঃশূদ্রগণ ছিল পূর্ববঙ্গের সবথেকে বড় জনগোষ্ঠী (Nation) আর সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁদের স্থান ছিল দ্বিতীয়। পূর্ববঙ্গের ছয়টি জেলা—বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর,

যশোহর, ময়মনসিংহ, খুলনা এবং ঢাকা ছিল মুখ্যত নমঃশূদ্র বসতি অঞ্চল। এছাড়া মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, নদিয়া প্রভৃতি জেলাতেও নমঃশূদ্রদের বসতি ছিল। পূর্ববঙ্গের এই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস করতেন পশ্চিম বাখরগঞ্জ আর দক্ষিণ ফরিদপুরের জলাভূমিতে ও অন্যান্য দুর্গম অঞ্চলগুলিতে। তাই সঙ্গত কারণেই এই অঞ্চলটিকে আমরা নমঃশূদ্রপ্রধান অঞ্চল বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান যার প্রধানতম কারণ ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় এবং তাঁদের কৌম ইতিহাসও যা সম্প্রদায় হিসাবে নমঃশূদ্রদের শক্তির-সম্মানের, মর্যাদার, শৌর্যের, শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রধান উৎস।

ভারত উপমহাদেশে প্রায় ৪ কোটিরও অধিক নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করছেন। তাদের সংখ্যা একসময় পূর্ববঙ্গেই বেশি ছিল। পূর্ববাংলার যশোহর জেলার নড়াইলে ও মাগুরায় এবং ঐ জেলার সর্বত্র—খুলনা, বাগেরহাট, ছিয়ানব্বই খালে আর এগারো খালে, এছাড়া ফরিদপুরের সর্বত্র তবে গোপালগঞ্জ ও মাদারিপুরেই অধিক সংখ্যক নমঃশূদ্র বসবাস করত। ঢাকার মুন্সিগঞ্জ ও সমগ্র ঢাকাতেও নমঃশূদ্রগণ অল্পবিস্তর ছিলেন।

বরিশাল জেলার উত্তরে এবং দক্ষিণে এবং সমগ্র বরিশালে বিশেষ করে পিরোজপুরে নমঃশূদ্র জনগণ বেশি ছিল। তাছাড়া ময়মনসিংহ, কুমিল্লা জেলার সর্বত্র এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবং উত্তরবঙ্গের পাবনার সিরাজগঞ্জে ও রাজশাহী জেলাতে এরা অধিকসংখ্যক বসবাস করতেন। উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতে নমঃশূদ্রদের অল্পবিস্তর দেখা যায়। নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামেও কিছুসংখ্যক নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন।

এছাড়া বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ওই জেলার সর্বত্র অল্পবিস্তর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সর্বত্র এবং কলকাতার চারদিকে ও হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষদের সংখ্যা অধিক। হুগলি, নদিয়া, বর্ধমান জেলার সর্বত্র নমঃশূদ্রগণ বসবাস করেন। পুরনো ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রচুর সংখ্যক নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতেন। বঙ্গভূমি ছাড়া আসামের সর্বত্র, বিহারের কিছু অংশে ও ওড়িশার বালেশ্বর জেলায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করতেন।

বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে উদ্বাস্তু মানুষজন ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিহারের বেতিয়ায়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, মহারাষ্ট্রে, রাজস্থানে, উত্তরপ্রদেশে, নৈনিতালে, ওড়িশায়, অন্ধ্রে, তামিলনাড়ুতে, মধ্যপ্রদেশে, পিলভিটে, বেরিলি, দিল্লি, দণ্ডকারণ্যেও উদ্বাস্তুরা বসবাস করছেন। এর ফলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বর্তমানে একটি সর্বভারতীয় জনগোষ্ঠী (Nation) হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশে, বিহার, ওড়িশা, দণ্ডকারণ্যে, আন্দামানে, অন্ধ্রে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, আসামের করিমগঞ্জে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অধিক সংখ্যক মানুষ বসবাস করছেন। বর্তমানে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বহু মানুষ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবেও বসবাস করছেন।

করছে। এমনকি এই চিকিৎসা ব্যবস্থা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে চাঁদসি চিকিৎসকগণ সমগ্র বঙ্গদেশ এবং গোটা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত প্রদেশে এবং ব্রহ্মাদেশে দক্ষতার সঙ্গে চিকিৎসা করে চলেছেন। কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বাইয়ের মতো বিশ্ববিখ্যাত বৃহৎ নগরীতে চাঁদসি চিকিৎসকগণ দক্ষতার সঙ্গে এই চিকিৎসার দ্বারা বহু দুরারোগ্য ক্ষত রোগীর রোগ চিকিৎসা করছেন।

চাঁদসি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তক ছিলেন বরিশালের চাঁদসি গ্রামের মহা ধন্বন্তরী স্বর্গীয় বিষ্ণু হরিদাস মহাশয়। চাঁদসি গ্রাম থেকে এই চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভব বলেই এই চিকিৎসা পদ্ধতির নাম 'চাঁদসির ক্ষত চিকিৎসা'। বিষ্ণুহরি দাস নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন এবং তিনি তাঁর বসতবাটিতে স্বাধীন জীবিকার উপায় হিসাবে চাঁদসি বিনা অস্ত্রে ক্ষত চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এরপর বিপিনবিহারী দাস, কেশবচন্দ্র দাস, লালমোহন দাস, ডা. মোহিনীমোহন দাস, এম. এল. সি. মহাশয় বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ছাত্রদিগকে চাঁদসি চিকিৎসা ব্যবস্থার উপযুক্ত করে সুচিকিৎসক করে তোলেন। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পূর্বে এই চিকিৎসা পদ্ধতি ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও চাঁদসির ক্ষত চিকিৎসা যা বিনা অস্ত্রে হয় তার জনপ্রিয়তা এখনও কমেনি।

নমঃশূদ্র সম্প্রদায় নন্দ রাজবংশের মহাপদ্মনন্দ এবং মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের উত্তরপুরুষ, যোদ্ধা জাতি হিসাবে তাঁদের শৌর্যবীর্যের পরিচয় পরবর্তীকালেও অব্যাহত রয়েছে। তাই দেখি বঙ্গদেশের একটি সামরিক প্রতিভাদীপ্ত সম্প্রদায়ের মানুষ হিসাবে নমঃশূদ্র বীর মহেশ মণ্ডল যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য-এর সেনাপতি হন এবং ৫২ হাজার ঢালি সৈন্য নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষজন নিয়েই গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এইসকল সৈন্যগণের বাসভূমি হয়ে ওঠে যশোহরের ছিয়ানব্বইখানা গ্রাম আর এগারোখানা গ্রাম। কেবল তাই নয়, নমঃশূদ্রগণ যে নৌসেনা হিসাবে দক্ষ ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে তাদের উপাধিতে, আজও 'বাছাড়' লেখা হয়। তা থেকেই 'বাছাড়ী' নৌকার নামকরণ করা হয়েছে। যোদ্ধা বীর জাতি হিসাবে নমঃশূদ্রের উপাধি যেমন আছে ঢালি, বাছাড়, তেমনি আছে সর্দার, রূপচাঁদ ঢালি, মহেশ মণ্ডল, বীর রামচন্দ্র মাল, বিখ্যাত বীর সর্দার রতন পেস্তা, অনন্ত সর্দার, বীর মহাদেব সর্দার, কৈলাস সর্দার, পূর্ণচন্দ্র সর্দার, ড্যাগা সর্দার, নারদ সর্দার, দুর্যোধন সর্দার, লঙ্কেশ্বর সর্দার প্রমুখ সর্দারগণ ঢাল, সড়কি, দাঁ-র ব্যবহারে অসীম সাহসী আর দক্ষ বীর সর্দারও। এই নমঃশূদ্র বীর সম্প্রদায় সম্পর্কে নেতাজি সবসময় বলতেন 'নমঃশূদ্র সম্প্রদায় পাঞ্জাবের শিখদের ন্যায় সাহসী এবং শক্তিমান'।

নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বীর যোদ্ধা ক্ষত্রিয় হলেও সাংস্কৃতিক অবদানও তাঁদের কম নয়। লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্প ও সঙ্গীত শিল্পেও নমঃশূদ্রগণ দক্ষ শিল্পী। বাংলায় লোকসংস্কৃতিতে বাউল, আউল, ভাবসঙ্গীত গায়ক ও লোককবি গায়ক হিসাবে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষদের খ্যাতি আছে। নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী মূলত বৌদ্ধ, কারণ তারা সব অশোকের বংশধর। বাংলায়

পাল বংশের রাজত্ব শেষ হলে সেন বংশের রাজত্ব, বৌদ্ধবিদ্বেষী বল্লাল সেন যখন বৌদ্ধদের নিধন করছিলেন, তখন বৌদ্ধগণ প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধকে আরাধনা করতে শিবের পূজা আরম্ভ করেন। শিবপূজার আড়ালে বৌদ্ধমত ও পথ রক্ষা পায়। অনার্য দেবতা শিবের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় দ্রাবিড়দের সংস্কৃতিতে। ফলে শিবমূর্তির মধ্যেই বুদ্ধকে প্রতিষ্ঠা সহজ ও সাংস্কৃতিক প্রকাশ। চৈত্রমাসের শেষে নীল তথা চড়কের পূজা। একে দোল উৎসবও বলা হয়। এই উৎসবে নমঃশূদ্রগণ পুরোহিতের কাজ যেমন করেন, তেমনি পায়ে মল বেঁধে বালাই শ্লোক গান করেন, যে বালাই শ্লোক তাঁরা নিজেরাই রচনা করেন। নমঃশূদ্রদের মধ্যেই 'বালা' উপাধির মানুষ অধিক আর এই নমঃশূদ্র 'বালা'রাই শিবপূজা তথা চড়কপূজার পুরোহিত ও মূলবালা সন্ন্যাসীও। চৈত্রসংক্রান্তিতে যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, নদিয়া এবং ২৪ পরগনায় নমঃশূদ্র জনসাধারণের মধ্যে বালাকি, দেল, চড়ক, পাটবান প্রভৃতি আড়ালে লোকায়ত শিবের মধ্য দিয়ে বুদ্ধের আরাধনায় নমঃশূদ্র সমাজ অনেক বেশি অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন।

মনসাদেবীর পূজা নমঃশূদ্রদের মধ্যে আরও একটি বহুল প্রচলিত লোকায়ত পূজা। সাপের উপদ্রব বাংলাদেশে বেশি থাকায় স্বভাবতই সাপের দেবী মনসাকে কেন্দ্র করে নানা পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, এটাই স্বাভাবিক লোকজীবন চেতনা। বরিশাল জেলাতে মনসা পূজা উপলক্ষে প্রায় রয়ানি গান বা মনসার গান অনুষ্ঠিত হয়। এই রয়ানি গান নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষজনই করে থাকে। বরিশালের কামিনী গাইন একজন বিখ্যাত শিল্পী। ঢাকা, যশোহর, খুলনা জেলায় মনসাপূজা উপলক্ষে নৌকাবাইচ অতি প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান। নমঃশূদ্র জনসাধারণের মধ্যে বারো মাসে তেরো পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়—ভাটি পূজা বা হেচড়া পূজা, সুবরে গান, গাউটে পূজা, বাস্তু পূজা, নবান্ন উৎসব, ধানসাধ অনুষ্ঠান প্রভৃতি লোকায়ত নানান উৎসব অনুষ্ঠান, মেলা, মহোৎসব-এর অঙ্গ।

এছাড়া নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু খ্যাতনামা মনীষী ও ধর্মসাধকদের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছেন। নমঃশূদ্রদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর, মতুয়া ধর্মান্দোলন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। হরিচাঁদের সুযোগ্য পুত্র শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া আন্দোলনকে আরও জনমুখী, গণমুখী করে তোলেন। এই দুই মহা মনীষী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করে গেছেন যা এক যুগান্তকারী...।

ভারত উপমহাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থায় আর ধর্মীয় পরিমণ্ডলে হাজার বছরের প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত সব ধ্যানধারণা, ভাবনাচিন্তা, আচার-ব্যবহার আর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মনীষী শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর বাস্তববাদী বিদ্রোহী চিন্তা-চেতনার বিপ্লব আনলেন। গৃহধর্ম, গৃহকর্ম আর নারীসহ গার্হস্থ্য ধর্ম, 'হাতে কাম মুখে নাম', 'জীবে দয়া নামে রুচি, মানুষের নিষ্ঠা'—এক নতুন ভাবনা, নতুন চেতনা, মহাবিদ্রোহী হরিচাঁদের এক যুগান্তকারী মত ও পথের দিশা দিলেন। তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ এই বৈপ্লবিক চেতনাকে শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে

নক্ষত্রের আলো, গায়ত্রীকে, ফিরে এসো চাকা, অঘ্রাণের অনভূতি মালা, বাল্মিকীর কবিতা বিখ্যাত। তিনি রুশ ভাষাবিদ। তিনি রুশ ভাষা থেকে অনেক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। কবিতার জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান। ক্ষিরোদবিহারী কবিরাজ কবিগান ও মতুয়া সাহিত্য, শরৎসমীক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন, শেফালী সরকার কয়েকখানি উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন, সুষমা মৈত্র কয়েখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন, কার্তিকচন্দ্র মল্লিক অনেকগুলি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছেন। হরেন্দ্রনাথ সমাদ্দার, রনজিৎ সিকদার, সুরেন্দ্রনাথ সিকদার, অনিলকৃষ্ণ মল্লিক, নরেশচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ দাস, বিমল বিশ্বাস, বিনোদবিহারী হালদার, সুধীর মল্লিক এসমকলেই নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

দলিত সাহিত্য সাহিত্যের নতুন দিক উন্মোচনের পর যাঁরা সাহিত্য রচনা করছেন তাঁদের মধ্যে অচিন্ত্য বিশ্বাস—'আদিবাসী জীবন সংগ্রাম', 'বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ', 'চারু বাউরির গান' রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। স্বপন বিশ্বাস ভারতীয় সমাজ উন্নয়নের ধারা, ভারতে আর্য আক্রমণ, ড. আম্বেদকরের মার্কসবাদ ও আম্বেদকরবাদের সন্তুয়ার্ন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। মনোহর বিশ্বাস—দলিত সাহিত্যের দিগবলয়, কৃষ্ণমৃত্তিকার মানুষ, বিবিক্ত উঠনের ঘর প্রভৃতি রচনা করেছেন। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর মধুমতী অনেক দূর, চলেছি চৈত্রের উৎসবে, মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুন্নত সমাজ, উজানতলীর উপকথা ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছেন। **যতীন বালা** 'মিনতি কেউ রাখেনি', আমার শব্দই শানিত অস্ত্র', 'মরিচ ঝাঁপির ময়না'—কবির কবিতা সংকলন, গণ্ডির বাঁধে ভাঙন, নেপো নিধন পর্ব, ছোটগল্প সংকলন—অমৃতের জীবন কথা, শিকড়ছেঁড়া জীবন উপন্যাস, দলিত সাহিত্য আন্দোলন, বস্তুবাদী মতুয়া আন্দোলন, ইতিহাসের আলোকে শ্রীহরিগুরুচাঁদ ও মতুয়া আন্দোলন ইত্যাদি গবেষণামূলক গ্রন্থ সমাজ চেতনার গল্প রচনা করেছেন। নকুল মল্লিক—মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে, ভাবনাচিন্তা, মহাসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনিল সরকার—শেষ পাটন, স্বজনের মুখ, কালবদলের ছড়া, প্রিজম ভ্যান, ব্রাত্যজনের কবিতা প্রভৃতি কবিতা সংকলন গ্রন্থের কবি। মনোরঞ্জন ব্যাপারী জিজিবিষার গল্প, চণ্ডাল জীবন, ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন ইত্যাদি গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। ড. মহীতোষ বিশ্বাস—মাটি এক মায়া জানে, বিনা অস্ত্রে যদ্ধ ইত্যাদি গল্প, উপন্যাস ও করিতাও লিখেছেন। রাজু দাস নাটক ও ছোটগল্প লিখেছেন। সমরেন্দ্র বৈদ্য উপন্যাস ও কবিতা লেখেন। মঞ্জু বালা কবি ও গল্পকার। কল্যাণী ঠাকুর কবিতা ও গল্প লেখেন। ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক ছোটগল্প ও উপন্যাস লেখেন। শান্তিরঞ্জন বিশ্বাসের প্রবন্ধের গ্রন্থ আছে কয়েকখানা। দেবাশিস মণ্ডল কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। অমর বিশ্বাস কবিতা লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন। আরও অনেক কবি-সাহিত্যিক আছেন নমঃশূদ্র সমাজে, যাঁরা সমাজকে কিছু দেবার জন্য জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ে যেমন অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমনি এই সম্প্রদায়ে সমাজ সংস্কারক ও চিন্তানায়কদেরও আবির্ভাব হয়েছে। বাংলার প্রত্যেকটি

নমঃশূদ্র প্রধান জেলাতে আঞ্চলিকভাবে এক-একজন সামাজিক জাগরণের নেতা ও চিন্তানায়ক জন্মগ্রহণ করেছেন। এই চিন্তানায়কদের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন বরিশালের আগুনঝরার বিখ্যাত নেতা ও সমাজসেবী ভ্যাগ্যই হালদার, ঢাকার বিখ্যাত জননেতা ডা. মোহিনীমোহন দাস এবং যশোহর জেলার মণিরামপুরের বিজয়কৃষ্ণ বালা। বিজয়কৃষ্ণ বালা ভারত সরকারের তাম্রপত্রধারী স্বাধীনতা সংগ্রামী। জননেতা ও সমাজসেবী ভীষ্মদেব দাস নমঃশূদ্র সমাজের মধ্যে প্রথম এম.এল.সি. মনোনীত হয়েছিলেন। গোপালগঞ্জের ডা. তারিণীচরণ বালা নমঃশূদ্র জাগরণের অন্যতম নেতা ছিলেন। এই সমাজের তিনিই প্রথম পাশ করা ডাক্তার। গোপালগঞ্জের গোপীনাথপুর গ্রামের পূর্ণচন্দ্র মল্লিক নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রথম যুগের সামাজিক ও শিক্ষামূলক জাগরণের আর আন্দোলনের নেতা ছিলেন। যশোহরের নড়াইলের শ্যামললাল বিশ্বাস নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং শিক্ষামূলক জাগরণের অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রথম যুগের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অন্যতম সামাজিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন ঢাকার প্রসন্নকুমার দাস। তাঁর লিখিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'জাতীয় জাগরণ' বিখ্যাত। এছাড়া রামপাল থানার সীতারাম মণ্ডল, কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ভারতচন্দ্র সরকার, ত্রিপুরা জেলার জগৎ মণ্ডল, ত্রিপুরা রাজ্যের ডা. প্রকাশচন্দ্র দাসচৌধুরি, অধরবাসী সরকার, রাজকুমার দাস, অরুন্ধতী মণ্ডল, আভা রায়, মনোমোহন দাস, দ্বারিকানাথ বিশ্বাস, চৈতন্য মণ্ডল, অমৃতলাল মণ্ডল, রজনীকান্ত দাস, হরিহর দাসচৌধুরি, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, রামমোহন মিশ্র, যামিনীভূষণ বিশ্বাস, শীতলচন্দ্র রায়, মাধবচন্দ্র বিশ্বাস, দলিত কুমার সিংহ, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, উদ্ধবচন্দ্র মজুমদার, ডা. কুমুদবন্ধু মজুমদার, ললিতকুমার বল, রামচন্দ্র মাল, কামিনী গাইন, মোহাগদলের ষড়ানন সমাদ্দার, বিভূতি সমাদ্দার, পিরোজপুরের সনাতন মসিদ, জব্দকাটির আনন্দ সাধক, পটুয়াখালির যামিনীমোহন রায়, কল্যাণব্রত রায়, বরিশালের চিত্তরঞ্জন সুতার, নিরোদ নাগ, ভুবনমোহন মণ্ডল, শ্যামলাল মিস্ত্রি, নিরোদবিহারী মল্লিক, জলিরপাড়ের রতনকুমার রায়, সিঙ্গাগ্রামের বলরাম সরকার, সুধন্যকুমার বাওয়ালী, শুচিডাঙা গ্রামের বিজয়চন্দ্র মজুমদার, মোল্লাকান্দির গোপাল রায়, মহাঢালী গ্রামের শিবুরাম সর্দার, গদাধর দাস, কিরণচন্দ্র দাস ও সুধন্য দাস, পাটগাড়ির জমিদার দ্বারিকানাথ মণ্ডল, শুচিতাডাঙার দুর্গাচরণ মজুমদার, যামিনীকান্ত হালদার, নবীনচন্দ্র ভৌমিক, সতীশচন্দ্র চন্দ, যশোহরের অনন্ত বিশ্বাস, রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, আনন্দ মণ্ডল, নেপালচন্দ্র মণ্ডল, যশোহরের কুচেমোড়ার কালিপদ বিশ্বাস, কালিচরণ কবিরাজ, রাধানাথ ভুটে, অভয়চরণ মল্লিক, জলধর বিশ্বাস, কামার গ্রামের ডা. গৌরপদ পাল, নারদ সর্দার, ববইচরা গ্রামের ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ইন্দুহাটি গ্রামের কমলাকান্ত দাস, হরিনাথ রায়, মামুদপুরের রাইচরণ টিকাদার, রমেন্দ্রকিশোর মল্লিক, লক্ষ্মীকাদর গ্রামের ত্রৈলেক্ষনাথ বিশ্বাস, ধুতিরাম টিকাদার, বৈঠাখালি গ্রামের লালন বিশ্বাস, শ্রীপুরের শ্রীকান্ত সর্দার, আড়াইদহ গ্রামের নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নড়াইলের কবিভূষণ বসন্তকুমার রায়, বরিশালের নিবারণ পাণ্ডে, সাতপাড়ের গয়ালীচরণ বিশ্বাস, ঠুটোবান্দা গ্রামের শ্যামলাল

বাংলাদেশের খুলনা শহরে। ডা. সীতানাথ মণ্ডলের আহ্বানে রাজর্ষি গুরুচাঁদ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নমঃশূদ্র মহাসম্মেলনের প্রথম শতবার্ষিকী তথা তৃতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভারতের পলতায় অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাসের আহ্বানে এবং ডা. সুধীরকুমার বাগচির সভাপতিত্বে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে।

নমঃশূদ্র চতুর্থ মহাসম্মেলন ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। সুধাংশুকুমার নিয়োগীর আহ্বানে এবং ড. উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

যে কোনও জনগোষ্ঠী (Nation) প্রথমে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংঘবদ্ধ হয়। সে আদর্শ মানুষকে কাছে আনতে, একে অন্যের মনের ভাব বিনিময় করতে সহায়ক হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তারা হয়ে ওঠে একে অপরের সুখদুঃখের সাথী। ধর্মীয় চেতনার মধ্য দিয়ে সামাজিক বাঁধন মজবুত হয়। জন্ম নেয় আত্মশক্তির। তারা হয়ে ওঠে বলবান, অন্যায় শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী করে তোলে। প্রতিবাদী চেতনা প্রগতির রাস্তা খুঁজে নেয়। কোনও একসময় সে জনগোষ্ঠীর মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করে।

পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা গেছে ধর্মবিপ্লবের পরই রাজনৈতিক বিপ্লবের পথ সুগম হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের ধর্মবিপ্লবের পরই সম্রাট অশোক রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যীশুর ধর্ম বিপ্লবের পর ব্রিটিশরা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাতে পেরেছিল। হজরত মহম্মদের ধর্মবিপ্লবের পর মুসলিমরা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরও তেমনি ভারতবর্ষে এক নতুন ধর্মবিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লব এখনও হয়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষ ভাগ তথা বাংলাভাগের মতো মহাঘটনা হয়তো তার পিছনে কাজ করেছে। ধর্মবিপ্লবের বীজ কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে তার অন্তর্নিহিত শক্তির জোরেই। তাই দেখি দেশভাগের মতো মহাঘটনার মহাবিপর্যয়ে, মহাদুর্যোগে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে সাতঘাটের জল খেয়েও নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজন মরে না, সমুদ্র পেরিয়ে গিয়ে অরণ্যের কঠিন শুষ্ক পাথুরে মাটিতেও ফের শিকড় ঢুকিয়ে প্রকৃতির রস টেনে নিয়ে বেঁচে থাকে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মহাঘটনার স্রোতে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজন ছিটকে পড়েছেন গোটা ভারতবর্ষে, ভারত-উপমহাদেশে। দেশভাগে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিলেও শ্রীহরিচাঁদের 'অমর বাণী'—'হাতে কাম মুখে নাম' তাদের জীবন থেকে কেড়ে নিতে পারেনি। সেই মহাশক্তির জোরেই নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজন আন্দামান, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, আসাম, ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র নতুন করে শিকড় গেড়েছেন। ফলস্বরূপ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়, নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী (Nation) এখন একটি সর্বভারতীয় জনগোষ্ঠী যার সর্বত্রগামী জয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে...সর্বত্রই...।

নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবিভক্ত বাংলার খুলনার মল্লিক পরিবারের মুকুন্দবিহারী

মল্লিক, নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর প্রথম এম. এ. পাশ, ১৯১৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মুকুন্দবিহারী মল্লিকই ভারতের তপশিলি শ্রেণির প্রথম অ্যাডভোকেট। মুকুন্দবিহারী প্রথম থেকেই নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর জাগরণে নেতৃত্ব দেন। মল্লিক পরিবারের কুমুদবিহারী মল্লিকের দুই পুত্রই, সুকুমার মল্লিক আই.সি.এস. এবং সুবোধকুমার মল্লিক যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গের ও আসামের চিফ সেক্রেটারির পদ অলঙ্কৃত করেন। গোপালগঞ্জের লক্ষ্মীনারায়ণ রায় নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ভারতের রাষ্ট্রদূর নিযুক্ত ছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ড. বিনয়কৃষ্ণ টিকাদার জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ড. সন্তোষকুমার সরকার নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রথম যাদবপুর ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। প্রফুল্লকুমার দাস এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতযুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর অসংখ্য মানুষ দেশে-বিদেশে সরকারি, বেসরকারি ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ নানা উচ্চদায়িত্বশীল পদে যোগ্যতার ও দক্ষতার সঙ্গে কর্ম করেছেন।

যে কোনও দেশের, রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি আপন গতিতে চলতে থাকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিবর্তন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বিবর্তনের গতি ধীর, মন্থর—কিন্তু অমোঘ অবশ্যম্ভাবী। প্রতিনিয়ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ভেতর থেকেই জন্ম হয় আন্দোলনের-বিপ্লবের। আন্দোলনই নতুন চেতনার আর জাগরণের গতি সুসমৃদ্ধ করে জনগোষ্ঠীর। সমাজের বিবিধ শ্রেণি আর বর্ণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক জটিল পরিস্থিতির পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আন্দোলনের বীজ আর বিপ্লবের বার্তা। সেই বীজই অঙ্কুরিত হয়ে পল্লবিত করে মূল্যবোধের নবনব বৃক্ষ তার ডালপালা, পাতা, ফুল। আর ফল সৃষ্টি করে জাগরণ আন্দোলনকে প্রাণচঞ্চল করে বিপ্লবমুখী করে সমাজ-মানুষকে। নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজন বেঁচে থাকার অমোঘ তাগিদে ছিলেন কৃষক শ্রমজীবী। কালের স্বাভাবিক নিয়মেই বিবর্তনের স্রোতে নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নতুন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বুদ্ধিজীবী বিদগ্ধজন হয়ে উঠছেন এবং ভাবীকালের জাতীয় জাগরণের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে চলেছেন—নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষের যাত্রা, ঐতিহাসিক যাত্রা, জীবন প্রয়োজনের তাগিদেই অবশ্যম্ভাবী অমোঘ হয়ে উঠছে, বীজের ভেতর যেমন অঙ্কুরোদ্গম, শক্ত মাটি ভেদ করে ওঠে, অঙ্কুরিত বীজ-চারাগাছ হয় উদ্ভিদ-বৃক্ষ-মহীরুহ...।

তথ্যসূত্র :

১. দলিত সাহিত্য আন্দোলন—যতীন বালা।
২. নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাঙ্গলাদেশ—নরেশ দাস।
৩. ইতিহাসের আলোকে শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ ও মতুয়া আন্দোলন—যতীন বালা।
৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়।
৫. শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া আন্দোলন—সম্পাদনা-কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, উৎপল বিশ্বাস।
৬. বাংলা ও বাঙালি —ধনঞ্জয় দাস মজুমদার।